নারী : স্বাধীনতার সময় ও স্বাধীনতার পরে

পুতুল সাউ [১] এবং করবী মিত্র [২]

ইতিহাস বিভাগ

বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজ, হাওড়া

৫/৩ মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ – ৭১১১০১, ভারতবর্ষ

[১]putulshaw524@gmail.com [২]karabimitra62@gmail.com

সংক্ষিপ্তসার

বিংশ শতাব্দীর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা পার্টিশন ছিল স্বাধীনতা অর্জনের এক ব্যাপক প্রয়াস। ব্রিটিশ শাসনের অধীন থেকে স্বাধীনতা অর্জন সহজ ছিল না। তবে বহু সংগ্রাম, আন্দোলনের পর ভারতবর্ষ ১৯৪৭ সালের ১৪ ই আগস্টের মধ্যরাতে অর্থাৎ ১৫ ই আগস্ট স্বাধীনতা অর্জন করে। বিভাজনের সময় কালে মুসলিমরা পাকিস্তান ও হিন্দুরা ভারতে চলে আসে। পার্টিশনকালে ট্রেন ও উদ্ধাস্তুদের পূর্ণ কনভয় বাহিনী উভয় দিক দিয়েই এমণ করেছেন।ফলে এসময়ে সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত ও অবহেলিত হয়েছিল নারীসমাজ। নারীদেরকে এসময়ে অপহরণ, ধর্ষণ, মৃত্যুর শিকার হতে হয়েছিল। বিশেষ করে পাঞ্জাব, সিন্ধু এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মত দুটি নতুন সীমান্ত এলাকায়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যেত পুরুষরা তাদের নিজ স্ত্রী ও কন্যাকে হত্যা করতেন। কারণ মুসলিমরা তাদের কাছে আসতে দ্বিধা করত না। অবিশ্বাস্যভাবে দাঙ্গা পরিস্থিতির দরুন সমাজের নারীরা প্রকৃত শিকারে পরিণত হয়। তাদের অপহরণ, ধর্ষণ, যৌন নির্যাতন এবং অন্যান্য অপবিত্রতা সাধারণ হয়ে ওঠে উক্ত সময়ে।

বিভাজন চলাকালীন নারীরা অধস্তন অবস্থার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিল। তাই এমতাবস্থায় ভারত ও পাকিস্তান সরকার নারী পুনরুদ্ধারের ও নারীদের মর্যাদা পুনর্নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। ফলে স্বভাবতই স্বাধীনতা অর্জন বা পার্টিশনের পর মনোযোগটা গিয়ে পড়ে নারীর আইনগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষাগত অবস্থার উন্নতিসাধন করার বিষয়ে। উনিশ শতকের প্রথম পাদে সামাজিক গোঁড়ামি নিয়ে প্রশ্ন তুললে নারী অবস্থার উন্নতিসাধনের ঘটনা সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের কেন্দ্রীয় প্রশ্নে পরিণত হয়। গান্ধিবাদী, সোশালিস্ট, বিপ্লবী, সমাজবাদী ও নারী আন্দোলন গুলিতে তারা অংশগ্রহণ করছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে ও রাজনীতিতে বর্তমানে তাদেরকে সমানাধিকার প্রদান করা হচ্ছে। ফলে নারী সাক্ষরতার হার ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে নারীরা যাতে এগিয়ে আসতে পারে তার জন্য স্বাধীনতা পরবর্তী কাল থেকেই নারীর অগ্রগতির বিষয়টি খতিয়ে দেখেছিল সরকার।

এই প্রবন্ধটির আসলউদ্দেশ্য হচ্ছে বিভাজন পূর্ববর্তী ও বিভাজন পরবর্তী সময়কালের নারীদের চিত্রটি তুলে ধরা। উক্ত সময়কালে নিজেকে কষ্ট, যন্ত্রণা, নির্যাতন, নিপীড়নের মধ্যে বাঁচিয়ে রেখে নারীরা পরবর্তী রাজনীতির পথে

অগ্রসর হতে পেরেছিল – এই বিষয়টিকেই তুলে ধরার প্রয়াস এই প্রবন্ধে করা হয়েছে। এমনকি এই নারীরাই ভবিষ্যৎ রাজনীতিতে নারী ইতিহাসকে নতুন মাত্রায় সংযোজিত করে একটা পৃথক ইতিহাস হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

সূচক শব্দ : নারী নির্যাতন, নারী পুনরুদ্ধার, নারী আন্দোলন, সমানাধিকার।

ভূমিকা

স্বাধীন ভারতের জন্মলগ্নে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু ১৪ ই আগস্টের মধ্যরাতে গণপরিষদের অধিবেশনে গভীর আবেগে বলেন, "মধ্যরাত্রির ঘন্টা যখন বাজবে, সমস্ত পৃথিবী যখন নিদ্রামগ্ন, ভারত তখন জেগে উঠবে জীবন ও স্বাধীনতার চেতনায় "। স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ভারত ভাগ হয়ে গিয়ে ভারত ও পাকিস্তান - এই দুটি পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত হলো। ব্রিটিশ শাসনের শৃঙ্খল থেকে ভারত এবার মুক্ত হল। বিভাজন নানা দিক থেকে ক্ষয়ক্ষতি কে বহন করে আনে। তবে পার্টিশনের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছিলো নারীদের ওপর। আমরা জানি যে নারী এক পবিত্র চরিত্র। কিন্তু পার্টিশনে নারীদের ওপরই সবচেয়ে বেশি নির্যাতন করা হয়েছিল।

বিভাজন অনুসরণ, ১৯৪৭-৪৮ সময়কালে মুসলমানরা পাকিস্তানে ও হিন্দুরা ভারতে আসে। যেহেতু বিভাজন, ট্রেন ও উদ্বাস্তুদের পূর্ণ কনভয় বাহিনী উভয় দিক দিয়েই ভ্রমন করেছে। এক্ষেত্রে নারী অভিবাসন ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পার্টিশনে নারীদের ওপর নানা ধরনের নির্যাতন তাদের অভিবাসনকে প্রভাবিত করত। এই কঠোর পরিস্থিতিতে একদিকে যেমন ভারত থেকে পাকিস্তানে অভিবাসন ঘটেছে অন্যদিকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ভারতে হিন্দু নারীদের অভিবাসন ঘটতে থাকে। এক স্থান থেকে অন্যত্র অভিবাসন চলাকালীন সময়ে পুরুষরা নারী অপহরণ, ধর্ষণ ও নানাভাবে তাদের নির্যাতন করত। নির্যাতনের বিষয়টি এত বড় আকার ধারণ করেছিল যা অল্প কথায় বলা যায় না। পাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মতো নতুন দুটি সীমান্ত এলাকায় এ ধরনের ঘটনা অভিমাত্রায় দেখা দেয়।

অপহরণ, ধর্ষণ ও সহিংসতা

নারীরা অপহৃত ও ধর্ষিত হয়। এমনকি তাদের ক্রয়-বিক্রয় ও শুরু হয়ে যায়। অপরিচিত লোকের সঙ্গে তারা বাধ্য হয়ে বাস করতে শুরু করে। অসময়ে নারীরা বিভিন্ন এজেন্টদের সহিংসতার শিকার হয়ে পড়ে। প্রায় ৩০ হাজার হিন্দু নারী ও ২৫ হাজার মুসলমান নারী (প্রায়) নানাভাবে নির্যাতন সহ্য করে চলে। তাদেরকে জোরপূর্বক বিয়ে দেওয়া হয়। সীমান্তের উভয় পাশে তাদেরকে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। তাদের স্তন কেটে ফেলে দেওয়া হত অনেক সময়। এমনকি নগ্ন উল্লাস করে তাদের রাস্তায় নিক্ষিপ্ত করে এই পার্টিশান। এমতাবস্তায় তাদের দেহগুলি অন্য সম্প্রদায়ের প্রতীক গুলির সাথে খোদাই করে ফেলা হয়। ১৯৪৭ সালের মার্চে রাওয়ালপিন্ডি জেলায় নারীদের বিরুদ্ধে

প্রতিহিংসতা শুরু হয়। এই সহিংসতা পাঞ্জাবের আসল সহিংসতার নামান্তর মাত্র। বহু নারী নিজেদের বলিদান দেওয়ার কথা ভাবে। যখন পুরুষ শত্রু থেকে তাদের রক্ষা করতে অক্ষম ছিল, অধিকন্তু নিজেকে স্বেচ্ছায় হত্যা করা এবং অন্যদের উৎসাহিত করার কাজটিও ছিল এক ধরনের সহিংসতা।

নারী হত্যা ও নারী পুনরুদ্ধার

বিভাজন সময়কালে নারীদের অপহরণ, ধর্ষণ, যৌন নির্যাতন, অপবিত্রতা যেমন বৃহৎ রূপ ধারণ করে তেমনি তা সহ্যসীমা হারালে নারীরা মৃত্যুর মুখে অগ্রসর হয়। অনেক ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হতো যে পুরুষরা তাদের নিজ স্ত্রী কন্যাকে এমনকি মাতাকে হত্যা করত, কারণ মুসলমান পুরুষরা তাদের নির্যাতন করতে দ্বিধা করত না। তাই দেখা যেত নিজ আত্মরক্ষার তাগিদে ও মর্যাদা রক্ষার্থে বহু নারী আত্মহত্যার পথ বেছে নিত। (উদাহরণ হিসেবে বলা যায় হাজার ১৯৪৭ সালে অনেক শিক্ষিত নারী রাওয়ালপিন্ডিতে থুয়া থলাসা গ্রামে আত্মহত্যা করে। অবিশ্বাস্যভাবে দাঙ্গা পরিস্থিতির ফলস্বরুপ স্বাধীনতার সময় নারীরা প্রকৃত শিকার হিসেবে চিহ্নিত হত। 'মনোজ জোশি'র মতে নারীরা তাদের আত্মীয়দের দ্বারা নিহিত বা স্বেচ্ছায় আত্মত্যাগ করে। কারণ তারা ভয় পেত যে তারা তাদের শত্রু দ্বারা লজ্ঘিত হবে। অপহৃত নারীদের তাদের নিজস্ব রাজ্যে, সম্প্রদায়, পরিবারে ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ 'পুনরুদ্ধারের অধিবেশন' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ১৯৪৭ সালের পাঞ্জাবের দাঙ্গা জেলার একটি যৌথ ভ্রমণে নেহেরু ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী (তৎকালীন) লিয়াকত আলী খান অপহরণের বিষয়টিকে নিন্দা করেন ও জোরপূর্বক রূপান্তরের স্বীকৃতি প্রত্যাখ্যান করেন। দু'দেশের মধ্যে আত্ম ডোমিনিয়নে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তখন থেকে নারী পুনরুদ্ধারের প্রোগ্রামের কাজ শুরু হয়। এক্ষেত্রে সন্ধানের প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল পুলিশের হাতে। নেহেরু সরকার পুনর্বাসন কাজকর্মে সফলতার জন্য নারী সামাজিক কর্মীদের মতো বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সহযোগিতা জোরদার করে। নেহেরু ১৮৪৮-র জানুয়ারিতে বলেন, "উভয়পক্ষ সত্যিই তাদের উদ্ধার করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছে, কিন্তু নারীদেরকে নতুন পরিবার থেকে পুরানো পরিবারে রূপান্তরের ক্ষেত্রে সরকার তাদের সঙ্গে পরামর্শ করা প্রয়োজন বোধ করলো না। ফলে অনেক নারীকেই তাদের পুরানো পরিবার অপবিত্র বলে চিহ্নিত করল। কিন্তু 'অ্যান্ড্রু মেজরে'র মতে পূর্বের প্রচারের বিপরীতে উদ্ধারকৃত অধিকাংশ নারীই সুখীভাবে তাদের পরিবারের সাথে মিলিত হন।

ডিসেম্বর, ১৯৪৭ থেকে ডিসেম্বর, ১৯৪৯ -র মধ্যে পাকিস্তান থেকে ৬০০০ নারী, ১২০০০ নারী ভারত থেকে উদ্ধার করা হয়। পূর্ব-পশ্চিম পাঞ্জাব, জম্মু ও কাশ্মীর এবং পার্টিশান থেকে বেশিরভাগ নারী পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল। ৮ বছরের বেশি সময় ধরে ৩০,০০০ নারীকে উভয় সরকারই ফেরত পাঠিয়েছে। মুসলিম নারীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে, ২০৭২৪৭ হাজার, ২৩২ অমুসলিম নারীর বিরুদ্ধে সর্বাধিক recoveries ১৯৪৭ এবং ১৯৫২ -র মধ্যে তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু recoveries ১৯৫৬ সার হিসেবে দেরিতে করা হয়। ১৯৪৭ -র ৩১ মার্চ ১৯৫২ সালের মধ্যে পাকিস্তান থেকে প্রখ্যাত মুসলিম নারীদের উদ্ধার করা হয়। এ সময়ে ভারতে মুসলিম নারীদের সংখ্যা

ছিল প্রায় ১৬,৫৪৫। তাদের মধ্যে প্রায় ১১,১২৯ পাঞ্জাব থেক, ৪৩৩৪ জন পাটিয়ালা থেকে এবং পূর্ব পাঞ্জাব থেকে, ১৯৪৯ -র পর জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৪৮২, দিল্লি থেকে ২০০২ সালে মুসলিম নারীদের উদ্ধার করা হয়েছিল।

বিভাজন নারীদের দেখায় যে, তারা এত নির্যাতন সহ্য করেও সমাজের অঙ্গ হিসেবে কখনই বিবেচিত হয়নি। তারা নিজ দেহ, মন ও কর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। তবে এই অবস্থা দীর্ঘদিন ধরে চলেনি। দীর্ঘ সংগ্রামের পর অবশ্য নারীরা নিজ উন্নতির কথা ভাবল। এক কথায় তারা উন্নতির পর্যায়ে উত্তরণের জন্য সকল প্রকার প্রয়াস করতে লাগল। স্বাধীনতার পরে নারীর সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আইনগত ও শিক্ষাগত অবস্থার নাটকীয় পরিবর্তন ঘটেছে। যখন উনিশ শতকের প্রথম পাদে রাজা রামমোহন রায় সামাজিক গোঁড়ামি নিয়ে প্রশ্ন তুলতে থাকেন, তখন থেকেই মেয়েদের অবস্থার উন্নতি ঘটানো সামাজিক আন্দোলনের কেন্দ্রীয় প্রশ্নে পরিণত হয়। তারপর বিশ শতকের বিশের দশক থেকে, বিশেষত ত্রিশের দশকে 'মৃদুলা সরাভাই', যিনি নারী আন্দোলনে ও স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহসী ভূমিকা পালন করেছিলেন। গান্ধিজী তাঁকে মধ্য ত্রিশ দশকের একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "ভারতের মেয়েদের আমি রান্না ঘর থেকে টেনে বার করে এনেছি ; তারা যাতে আর সেখানে ফিরে না যায় সেটা দেখা তোমাদের (নারী আন্দোলনকারীদের) কর্তব্য (I have brought the Indian women out of the kitchen, it is up to you to see that they are not go back)." বিশের দশকের পর থেকে বড় বড় গণআন্দোলনে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ফলে মেয়েদের সামনে সম্ভাবনার নতুন নতুন পথ খুলে গেল। ২০০ বছরের সমাজ সংস্কার আন্দোলন যা পারেনি, তা এবার সম্ভব হল। উনিশ শতকের মেয়েদের ভাবমূর্তি ছিল ন্যায়বিচার প্রার্থীর ন্যায়। বিশ শতকের প্রথম দিকে তারা হলেন পুরুষদের উগ্র সমর্থক। তার ত্রিশ আর চল্লিশ দশকে হয়ে দাঁড়ালেন কমরেডের ভাবমূর্তি। জাতীয় আন্দোলনের সর্বস্তরে মেয়েরা অংশগ্রহণ করেছেন।

গান্ধিবাদী, সোশালিস্ট, কমিউনিস্ট, বিপ্লব সন্ত্রাসবাদী, ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক আন্দোলনে মুক্ত হয়েছেন নারীরা। স্বাধীনতার পরে এখন সময় এলো এতদিনের কঠিন লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে যা অর্জিত হয়েছে তাকে গুছিয়ে তোলার। তখন স্বভাবতই মনোযোগটা গিয়ে পড়ল আইনি ও সাংবিধানিক অধিকার গুলিকে সুনিশ্চিত করার দিকে। বহুকাল আগে জাতীয় আন্দোলনে সংবিধানে মেয়েরা পূর্ণসাম্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, যা এবার পূর্ণ হল। ছেলেদের মতো মেয়েরাও ভোটাধিকার পেল শিক্ষা, সম্পত্তি ও আইন বিশেষে। যে অধিকারের জন্য নারী ভোটাধিকারীদের কঠিন লড়াই করতে হয়েছিল - সে অধিকার তারা পেল। "The Hindu code passed as separate acts between 1950 and 1955, rewrote the hindus the laws of marriage and divorce, adoption and inheritance".

১৯৫০ -র দশকের শুরুতে নেহেরু "হিন্দু কোড বিল" প্রচলনের সূচনা করলেন যার জন্য মেয়েরা ত্রিশের দশক থেকে দাবি জানিয়েছিল। এবারে একটি সমর্থক ঘটনার দিকে নজরটা গিয়ে পড়ল তা হল নারী-পুরুষ বৈষম্য

জনিত অবিচারের একটা প্রকট রূপগুলির প্রতি। যথা গণ মৃত্যু, ধর্ষণ, মদ্যপান জনিত গার্হস্থ্য নিগ্রহ ইত্যাদি। সত্তর থেকে নব্বই এর দশক ধরে এসব বিষয় নিয়ে নানা আন্দোলন চলেছে - কোনোটা স্থানীয় মাত্রায় আবার কোনোটা ব্যাপক মাত্রায়। জাতীয় আন্দোলনের সময় থেকে যেসব রাজনৈতিক শক্তি রাজ করেছিল। স্বাধীনতার পরে তারা যে যার পথে চলতে লাগলো। এমনকি নারী আন্দোলনেও বৈচিত্র এল। অনেক নেতৃনারী মঙ্গল সংক্রান্ত বা প্রণোদিত ও নানা প্রতিষ্ঠানিক যুক্ত হলেন। বিভাজনের সময় ব্যাপক যান চলাচল ও দাঙ্গার দরুন যেসব নারী হারিয়ে গিয়েছিলেন এবং বলা যেতে পারে পরিত্যক্ত হয়েছিলেন তাদের পুনর্বাসন ও উদ্ধার কর্মরত মহিলাদের জন্য শহরে নারী হস্টেল স্থাপন এবং মেয়েদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন - এমন কর্মোদ্যোগের অঙ্গ হয়ে পড়ে। ১৯৪৫ কমিউনিস্ট মহিলারা সারা ভারত নারী অধিবেশন' ছেড়ে ভারতীয় জাতীয় নারী সংঘ প্রতিষ্ঠা করলেন। তবে এটি হয়ে উঠল পার্টিমঞ্চ; ঐক্যবদ্ধ নারীমঞ্চের ব্যবস্থা কিন্তু আন্দোলন সমূহে ভূমিকা পালনের প্রয়োজনীয়তা সব সময়ই দেখা দেয়। এসব আন্দোলন গুলির মধ্যে নারী সংগ্রাম গুলি উত্থাপন করা সহজ হয়েছিল।

বাংলায় ১৯৪৬ সালে তেভাগা আন্দোলনের সময় নারীবাহিনী নামক এক আলাদা মঞ্চে নারীরা নিজেদের সংগঠিত হয়েছিল। এ সময় তারা নানা বাহিনী গড়ে তোলে, যেমন : ঝাঁটা বাহিনী ইত্যাদি। সে সময়ের অপর যে কমিউনিস্ট কৃষক আন্দোলনের কথা চোখে পড়ে তাতে হায়দ্রাবাদের তেলেঙ্গানাতে মেয়েদের অংশগ্রহণের বিষয়টি চোখে পড়ে। 'লক্ষ্মী সিলগম' তাঁর "Taking stock : Women's Movement and the state" শীর্ষক রচনায় বলেছেন "The autonomous women's movement as an integral part of the broader non-party movement sector in the early 1970's and blossomed in the wake of the internal emergency in 1975."

নারী আন্দোলনসমূহ

ষাট সত্তরের দশকে এক রাজনৈতিক জাগরণ ঘটে। এ সময়ে নানা আন্দোলন যেমন চিপকো আন্দোলন, মূল্যবৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলন অঞ্চলভিত্তিক এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। অতঃপর পিতৃতান্ত্রিক সমাজের নারী নির্যাতন সংক্রান্ত সমস্যার মোকাবিলায় যে ধরনের আত্মপ্রত্যয় দরকার তা অর্জনে নারীরা সক্ষম হলেন।

"সুন্দরলাল বহুগুণা'' প্রমুখ মদ্য বিরোধী আন্দোলন হয়েছিল। গান্ধিজীর শিষ্য সরলা বেন ও মীরা বেন চিপকো আন্দোলনের জন্য বিখ্যাত হয়েছিল। ১৯৪৭ সাল থেকে উত্তরাখণ্ডের মহিলারা চিপকো আন্দোলন নিয়ে সক্রিয় হয়ে উঠলেন। গাছ যাতে কাটা না যায় তার জন্য মহিলারা গাছকে জড়িয়ে চেপে ধরে এই আন্দোলন শুরু করেছিলেন। তা থেকেই চিপকো নামের উৎস। এটিই ছিল প্রকৃতিকে বাঁচানোর প্রথম আন্দোলন। তাই একটা উপলব্ধি জন্মায় যে প্রকৃতিকে লালন-পালন করার কাজের ক্ষেত্রে মেয়েদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। পরিবেশ সংরক্ষণের সহায়ক প্রথম বৃক্ষ আন্দোলন হিসেবে চিপকো আন্দোলন পরিচিত ছিল। ১৯৪৮ সালে ভোপালে 'ইউনিয়ন কার্বাইড'

কারখানা থেকে রাসায়নিক গ্যাস বেরিয়ে আসার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন যারা তাদের হয়ে ন্যায়বিচার আদায়ের জন্য প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল "ভোপাল গ্যাস পিড়ীত মহিলা উদ্যোগ সম্মেলন।"

এই প্রক্রিয়ায় নারী-পুরুষ সম্পর্কে রাজনৈতিক সংগঠনের নারীদের স্থানের প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ১৯৪৭ সালে গঠিত হায়দ্রাবাদের আস্মনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় 'প্রগতিশালী নারীসংঘ'। ১৯৭৫ সালের পুনের ‘পূরগামী স্ত্রী সংগঠন’ ও বোম্বাই –এ স্ত্রী মুক্তি সংগঠন ইত্যাদি নানা সংস্থা স্থাপনের মধ্যে দিয়ে এই ধারার সূএপাত ঘটে। রাষ্ট্রসংঘ ১৯৭৫ সালকে ‘আন্তর্জাতিক নারী দিবস’ বলে ঘোষণা করে। ১৯৭৭ সালে দিল্লির এক মহিলার একটি স্থায়ী নারী সংস্থা চালু করে যা নারী আন্দোলনে স্থায়ীরূপে পরিণত হয়েছে। 'মানুষী পত্রিকা' নারী আন্দোলনের দলিল লিপিবদ্ধ ও বিশ্লেষণ করেছে, এমনকি ইতিহাসও জানিয়েছে। 'মধু কিশোয়া'র নেতৃত্বে এটি নারী আন্দোলন সবচেয়ে মৌলিক আত্মবিশ্লেষণ ও নির্ভীক কণ্ঠস্বরগুলির অন্যতম।

"রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধি, ভারতের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী (১৯৬৬ - ৭৭) এবং শ্রীমতী গান্ধি (১৯৮০ - ৮৪) যারা প্রমাণ করেছেন যে স্বাধীনতার পরে নারীদের উন্নতি অবশ্যই হয়েছিল।" অন্য যে বিষয়টি আমাদের চোখ এড়ায় না তা হল নারীদেরকে পুলিশের ধর্ষণ সহ্য করতে হয়েছে। ১৯৭৮ -র হায়দ্রাবাদের 'রামিজা বী' এর মামলা, ১৯৮০ র মহারাষ্ট্রের মথুরা মামলা ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের মায়াত্যাগীর মামলা পুরো ব্যাপারটাকে লোকচক্ষুর গোচরে নিয়ে আসে। ১৯৮০ সালে ধর্ষণ সংক্রান্ত আইনটি ১৯৮৩ সালে সংশোধিত হওয়ার ফলে এক পরিবর্তন আনা হলো যে, পুলিশি হেফাজতে ধর্ষণের চেয়ে অনেক গুরুতর অপরাধ বলে গণ্য করা হবে। এবং প্রমাণের দায় দর্শনের শিকারের বদলে অভিযুক্তর উপরে চাপানো হবে। ফলে অভিযুক্তদের দোষী প্রমাণের সম্ভাবনা বহুগুণে বেড়ে যায়। ১৯৮৮ সালে জাতীয় প্রেক্ষিতে নারী পরিকল্পনা গঠন করে নারীস্বাস্থ্য, নারীশিক্ষা, রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত পরিকল্পনা পেশ করা হবে। ১৯৮৯ সালে পঞ্চায়েতী বিল পেশ করা হয় (যদিও তা গৃহীত হয় ১৯৯৩ সালে) তাতে পঞ্চায়েতী আসনের এক-তৃতীয়াংশ মেয়েদের জন্য রাখা হয়।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, বিভাজন শুধু নারী নয় সম্পূর্ণ সমাজকে ওলোট-পালোট করে দিয়েছিল। এই সমাজের মধ্যে বেশি করে নির্যাতিত ও অবহেলিত হয়েছিল নারীরা। বিভাজনের সময় কালে নারীরা অবহেলিত, নির্যাতিত অপহৃত হলেও নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছিল যদিও সমাজে তাদের কোন স্থান ছিল না। বিভাজনের পর দেখা যায় স্থানীয় ও জাতীয় স্তরে রাজনৈতি, শিক্ষাগত এমনকি নানা বিষয়ে নারীরা এগিয়ে আসার প্রচেষ্টায় সফল হয়েছিলেন। এমন ধরনের প্রয়াস আগে হচ্ছিল, বর্তমানেও আছে এমনকি ভবিষ্যতেও এই প্রয়াস চলতে থাকবে।

“নারীঃ স্বাধীনতার সময় ও স্বাধীনতার পরে”- এই প্রবন্ধটিতে বিভিন্ন পর্বে সংঘটিত নানান পরিস্থিতির যেসব আলোচনা আমরা পাই, তার একটা ব্যাপক প্রাসঙ্গিকতা আছে। বিভাজন পূর্ববর্তী পর্যায় থেকে আরম্ভ হওয়া নারী নির্যাতন, নারী আন্দোলন আজও দেশের কিছু কিছু অংশে বিদ্যমান। যদিও নারী আন্দোলনগুলি বর্তমানে অনেকক্ষেত্রেই গণআন্দোলনের চেহারা পায়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আজও নারীশিক্ষা, নারীহত্যা, নারী ধর্ষণ সম্বন্ধীয় বিষয়গুলি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

সূত্র নির্দেশ

১) www.google.com

2) "ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরে, ১৯৪৭-২০০০” - বিপান চন্দ্র, মৃদুলা মুখার্জি, আদিত্য মুখার্জি, 1999, Ananda Publishers Private Limited।

৩) "ভারত ইতিহাসের নিম্নবর্গের নারী শ্রমিক - এদের সংকট ও সংগ্রাম" (উনিশ থেকে বিশ শতক) অমল দাশ।

৪) "ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি" - অনাদিকুমার মহাপাত্র, SURIDH PUBLICATION, 14TH EDITION.

৫) "Women in Modern India" - Geraldine Forbes, 1996, Cambridge University Press, New York.

৬) "ভারত ও আধুনিক বিশ্বের ইতিহাস" - ডঃ চট্টোপাধ্যায় ও মুখোপাধ্যায়, 2009, Prantik, Kolkata.

গ্রন্থপঞ্জি

১) 'চট্টোপাধ্যায়, ড. প্রণব কুমার ; মুখোপাধ্যায়, সুদেব', " ভারত ও আধুনিক বিশ্বের ইতিহাস", p.১২০

২) 'চন্দ্র, বিপান ; মুখার্জি, মৃদুলা, মুখার্জি, আদিত্য' - ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরে", ১৯৪৭-২০০০, p.

৩) 'Forbes, Geraldine', "women in modern india", Cambridge University Press, p.২২৩

৪) 'মহাপাত্র, অনাদিকুমার' - "ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি", সুহৃদ পাবলিকেশন, P.১১০১

৫) 'Forbes, Geraldine' - "Women in Morden India", Cambridge University Press, p. 231